ইসলাম

অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

১

(ইসলাম ও কুরআনের পরিচয়)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

কুরআন গবেষণায় দক্ষতা

কীভাবে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করব ১৫

অনুবাদ কী ২১

লিপান্তর বা অক্ষরীকরণ কী ২৫

কুরআনকে কীভাবে কাজে লাগাব ২৮

অধ্যায়-২

কুরআনের সঠিক উপলব্ধি

কুরআন কীভাবে নাজিল হয়েছিল ৩৫

কুরআন কীভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল ৩৯

কুরআন অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ ৪৩

মুজিজাসংবলিত গ্রন্থ ৪৮

কুরআন ও বিজ্ঞান ৫৩

অধ্যায়-৩

সৃষ্টি বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

মহাবিশ্বের সৃষ্টি ৬৭

ইসলাম এবং ডাইনোসোর ৭৯

মানুষের আদি উৎস ৮৭

আমরা কেন এখানে ৯৯

অধ্যায়-৪

ইসলাম কী

ইসলাম মূলত কী ১১৫

মুসলিম কে ১৩২

কিছু মানুষ অবিশ্বাসী কেন ১৪৩

কীভাবে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করব

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—ইসলাম সম্বন্ধে পড়াশোনা করার সর্বোত্তম উপায় কী।

ইসলাম কী

'ইসলাম' এমন একটি জীবনপদ্ধতি, যা গোটা বিশ্বে প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষ অনুসরণ করে। সাধারণভাবে যারা ইসলাম অনুসরণ করে, তাদের বলা হয় মুসলিম। বিশ্বে ৫০টিরও বেশি দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সংখ্যা প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

'ইসলাম' মূলত একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ 'শান্তি এবং আত্মসমর্পণ'। ইসলামের একটি শাব্দিক সংজ্ঞায়ন হলো—যখন আপনি নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে পুরোপুরি সমর্পণ করতে পারবেন, তখনই কেবল অন্তরে শান্তি অনুভব করবেন। অর্থাৎ একজন মুসলিম হলেন তিনি; যিনি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং এর বিনিময়ে খুঁজে পান শান্তি।

ইসলাম নিছক কোনো ধর্ম নয়; বরং একটি পরিপূর্ণ জীবনপদ্ধতি। গোটা মহাবিশ্বই সহজাত ও প্রকৃতিগতভাবে অনুসরণ করে ইসলামকে। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো–প্রকৃতি ও অস্তিত্বের প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি জীবনযাপনে মানুষকে সহায়তা করা।

বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগে আল্লাহ তায়ালা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রণয়ন করেছেন একটি প্রাকৃতিক বিধানও এবং গোটা বিশ্বের সকল উপাদান ও উপকরণকে তাঁর ইচ্ছার আলোকেই পরিচালিত হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এই বিবেচনায় আমরা গোটা মহাবিশ্বকেই মুসলিম বলতে পারি। কেননা, তা আল্লাহর ইচ্ছার নিকটই আত্মসমর্পণ করেছে।[১]

কিছু কিছু গ্রহে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তায়ালা জীবন্ত প্রাণীর বিকাশ ঘটিয়েছেন। এমনই একটি গ্রহ পৃথিবী। এখানে খুবই কার্যকর একটি বাস্তুসংস্থানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রাণিজগতের ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

[১] সূরা ইবরাহিম : ১৯-২০

পৃথিবী সৃষ্টি করার অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তারা ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে আগত অন্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা। তাদের বুদ্ধিমত্তা আছে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে।

বিড়াল, বানর, মাছ, ব্যাঙ বা গাছ–কেউই তাদের সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতির নির্দেশনার বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারে না। কিন্তু মানুষকে তার মতো করে জীবনযাপনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষের ওপরও প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব রয়েছে। তবে তা অন্য প্রাণীর তুলনায় অনেকটাই শিথিল।

আমাদের উদ্দেশ্য কী

মানুষকে মুক্ত জীবনযাপন করার যে সুযোগটি দেওয়া হয়েছে, তার কিছু পরিণতিও আছে। আল্লাহর সৃষ্টি মহাবিশ্বে কোনো অনিয়ম নেই,। নেই কোনো বিশৃঙ্খলাও। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে পুরো হিসাবটাই অন্যরকম। সমাজের চলমান ধারাবাহিকতায় মানুষ চাইলে শান্তিপূর্ণ বিধিবিধান মেনে চলতে পারে। আবার নেতিবাচক পথে চলে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ধ্বংসের দিকেও। করতে পারে নিজের ভেতরকার পাশবিক প্রবৃত্তির চাষাবাদ।

খুব সংক্ষেপে বলা যায়—মানুষ ইচ্ছে করলে উৎকৃষ্ট বিধানগুলো মেনে চলতে পারে। আবার নিম্নস্তরে ধাবিত হয়ে নেমে যেতে পারে বুদ্ধিবৃত্তিহীন পশুত্বের পর্যায়েও। আল্লাহ চান, মানুষ তার আবেগ ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে এই মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্যের সন্ধান করার চেষ্টা করবে। লোভ-লালসা, সহিংসতা বিসর্জন দিয়ে জয় করতে পারবে নিজের ভেতরে থাকা পাশবিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে।[২]

সত্যের সন্ধানে মানুষের এই যাত্রায় সহযোগিতা করার জন্য আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকেই কিছু পথ নির্দেশক বেছে নিয়েছেন, যাদের বলা হয় নবি ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর যাবতীয় বার্তাগুলো নবি-রাসূলগণের মাধ্যমেই প্রাথমিকভাবে পাঠাতেন। আর তাঁরা তা পৌঁছে দিতেন সাধারণ মানুষের কাছে।

নবিগণ ছিলেন ঝড়ের মাঝে উজ্জ্বল বাতিঘরের মতো। তাঁরা এই সমস্যাগ্রস্ত পৃথিবীতে মানুষকে মুক্তির দিকে আহ্বান জানাতেন। কোনো কোনো নবির কাছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বার্তাগুলো লিপিবদ্ধ ও গোছানো অবস্থায় পাঠিয়েছেন। এভাবে লিপিবদ্ধ বার্তা প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ যেন এগুলো নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করতে পারে।

কিন্তু সত্যনিষ্ঠ বার্তা পাওয়ার পরও অধিকাংশ মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্বেই লিপ্ত থাকে। ফলে উদ্ভব হয় যুদ্ধ আর সংঘাতের। জমিনে ফিতনা, ফ্যাসাদ, বিশৃঙ্খলা, ঘৃণা আর নৈরাজ্যের বিকাশ ঘটে। এর বিপরীত অবস্থাটাই হলো শান্তি।

---

[২] সূরা জাসিয়া : ২২; সূরা আহকাফ : ৩

যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথকে পছন্দ করবে, তাদের দেওয়া হয়েছে পরকালীন জীবনে পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি। আর যারা এই পথকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক ও ভয়াবহ শাস্তি। কারণ, এই পাপীরা কেবল আল্লাহর নির্দেশনা অমান্য করে না, সেইসঙ্গে নিজেদের ভেতরকার সহজাত ইতিবাচক ফিতরাতকেও অবজ্ঞা করে। এই ফিতরাতই তাদের ভালো হওয়ার জন্য তাগাদা দেয়। কিন্তু তারা বরং লজ্জা আর অনিষ্টতার পথকেই পছন্দ করে।[৩]

যখন এই মহাবিশ্বের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা এর প্রতিটি উপকরণ ধ্বংস করে দেবেন। ফলে সবকিছুই তার আদিরূপে ফিরে যাবে। সকল মানুষকে আবারও রোজ হাশরের দিনে জমায়েত করা হবে। তারা এই পৃথিবীতে থাকাকালীন কী করেছে—তা তাদের দেখানো হবে। তারা পুরস্কার পাবে নাকি শাস্তিই তাদের একমাত্র পাওনা, সবই সেদিন স্পষ্ট হয়ে যাবে।[৪] তবে যাদের মাঝে একনিষ্ঠতা ও ঈমান আছে, তাদের ছোটোখাটো ভুলগুলো ক্ষমা করা হবে এবং রহম করা হবে তাদের প্রতি। এরা হলেন সেই সব সৌভাগ্যবান মানুষ, যারা তাদের চূড়ান্ত গন্তব্যকে চিনতে পেরেছিলেন, আল্লাহর রাস্তায় চলার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশনার আলোকে জীবনযাপন করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তায়ালাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা কীভাবে সভ্য হতে পারব; তিনিই তা সবচেয়ে ভালো জানেন।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর পূর্বে যে সকল নবি ও রাসূল পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ জনগোষ্ঠীর দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমরা তাঁদের মাত্র কয়েকজনের নাম জানি। যেমন : ইবরাহিম (আ.), মুসা (আ.), সালেহ (আ.), ঈসা (আ.) প্রমুখ।'[৫]

মানবতার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ নির্দেশনা নিয়ে যে নবি এসেছিলেন, তাঁর জন্ম ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরবে। তিনি হলেন বিশ্বনবি মুহাম্মাদ (সা.)। আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ বার্তাগুলো যে মহাগ্রন্থে আমরা পাই, তা-ই হলো আল কুরআন। আল কুরআনে মানুষের মন ও অন্তরকে উৎকৃষ্টতার শিখরে নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় নির্দেশনা রয়েছে।

কুরআন মানুষকে এমন একটি স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ তার সহজাত পাশবিক প্রবৃত্তিগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিতে পারে ন্যায়ের পক্ষে এবং মন্দ থেকে মানুষকে দূরে রাখতে পারে। একইসাথে নিজেও সংযত থাকতে পারে। মহান আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেন—

> 'আসলে এ কুরআন এমন পথ দেখায়, যা একেবারেই সোজা। যারা একে নিয়ে ভালো কাজ করতে থাকে, তাদের সে সুখবর দেয় এ মর্মে, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে।'[৬]

---

[৩] সূরা আনআম : ১১৩-১১৭
[৪] সূরা মাআরিজ : ১৯
[৫] সূরা মুমিন : ৭৮

কুরআনকে কীভাবে কাজে লাগাব

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—কীভাবে যত্ন ও গুরুত্বের সাথে আমরা কুরআনকে কাজে লাগাতে পারি।

যথাযথ সম্মানের সাথে কুরআন পড়া

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন—

> 'দেখো, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অন্তর্দৃষ্টির আলো এসে গেছে। এখন যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগাবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যে অন্ধ সাজবে, সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই।'[৭]

এই আয়াতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মূলত আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা সত্য দেখার বিষয়ে চোখ খোলাও রাখতে পারি আবার অন্ধ করেও থাকতে পারি। কুরআন যে আল্লাহরই বাণী, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো—কুরআনে থাকা অলৌকিক সব বিষয় ও বক্তব্যসমূহ। কে আছেন কালক্ষেপণ না করে এখনই কুরআনের এই বক্তব্যগুলো জানার ও বোঝার চেষ্টা করবেন?

কুরআনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদিস

১. 'কুরআনের কারণে আল্লাহ কিছু মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, আবার কিছু মানুষকে নিচে নামিয়ে দেন।'[৮]

২. 'যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে লেবুর মতো; যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন খেজুরের মতো; যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক ব্যক্তির কুরআন

---

[৬] সূরা বনি ইসরাইল : ৯
[৭] সূরা আনআম : ১০৪
[৮] মুসলিম

পাঠের দৃষ্টান্ত হচ্ছে রায়হান জাতীয় লতার মতো, যার সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে বিস্বাদ। আর কুরআন পাঠ না করা ফাসিকের উদাহরণ হলো মাকাল ফলের মতো, যা খেতেও বিস্বাদ এবং সুগন্ধও নেই।'[৯]

৩. 'যে ব্যক্তি কুরআনের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে, তার স্থান হবে সম্মানিত ফেরেশতাদের সান্নিধ্যে। আর যে ব্যক্তি ঠেকে ঠেকে কুরআন পড়ে অর্থাৎ কুরআন পড়তে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও চেষ্টা করে যায়, সে এজন্য দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।'[১০]

তবে কুরআন বুকশেলফে বা অন্য কোথাও ফেলে রাখার মতো কোনো গ্রন্থ নয়। এটি এক ঐশ্বরিক জীবনবিধান। যদি কোনো ব্যক্তি কুরআন থেকে সত্যিকারার্থেই কল্যাণ পেতে চায়, তাকে অবশ্যই এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এর কাছে আসতে হবে আদবের সাথে। কারণ, এটি মহান রাব্বুল আলামিনের পবিত্র বাণী।

আপনার শিক্ষক কিংবা অফিসের বস কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা সংবলিত কাগজ দিলে কি আপনি যেখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলেন? না; বরং অত্যন্ত যত্নের সাথে রাখেন; এমনকি বিছানার তোশকের নিচেও রেখে দেন না। তাহলে কুরআনকে কেন অবহেলা করবেন?

অথচ কুরআনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই, হতেও পারে না। কুরআন হলো মানুষের জন্য একটি নির্দেশনা; যা অনুসরণ করে তারা পৃথিবীতে যেমন ভালোভাবে বাঁচতে পারে, তেমনি আখিরাতেও লাভ করতে পারে স্বস্তি ও পুরস্কার ।

তাই কুরআন অধ্যয়ন বা গবেষণার দিকে অগ্রসর হতে চাইলে সবার আগে আমাদের কুরআনসংক্রান্ত আদব ও শিষ্টাচারগুলো জানতে হবে। রপ্ত করতে হবে কুরআনকে লালন করার কৌশলগুলো। কুরআন শেখা খুব কঠিন কিছু নয়।

আপনি যদি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন—কুরআন প্রকৃতপক্ষেই একটি বিশেষ গ্রন্থ, তাহলে এটি পড়ার ও ধারণ করার কৌশলগুলো জেনে আপনি হবেন পুলকিত এবং এটিকে আরও বেশি সম্মান করবেন।

কুরআন অধ্যয়নের আদব ও শিষ্টাচারসমূহ

১. কল্পনা করুন তো, আপনি দুই হাত দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বাণীকে ধরে আছেন। আপনার কি উচিত নয় কুরআনের বিষয়ে বিনয়ী থাকা? আল্লাহ তায়ালা বলেন—'যখন কুরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তা শোনো মনোযোগ সহকারে এবং নীরব থাকো, হয়তো তোমাদের প্রতিও রহমত বর্ষিত হবে।'[১১]

---

[৯] বুখারি

[১০] মুসলিম

[১১] সূরা আ'রাফ : ২০৪

২. যদি কোনো ব্যক্তির শরীর ফরজ গোসলের উপযোগী থাকে, তাহলে তাকে গোসল করে তারপর কুরআন পড়তে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—'পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।'[১২]

৩. যদি অজুর প্রয়োজন হয়, তাহলে অজু করেই কুরআন পড়ার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৪. কিবলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

৫. কুরআন পাঠের সময় কোনো ধরনের পানাহার করা যাবে না।

৬. তিলাওয়াত করতে গিয়ে কিয়ামতের বর্ণনা পেলে পাঠকের মনে পরকালবিষয়ক ভয় জাগ্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—'এটা এজন্য যে, তারা আখিরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি এমন সব লোককে মুক্তির পথ দেখান না, যারা তাঁর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়।'[১৩]

> 'আমি যদি এই কুরআনকে কোনো পাহাড়ের ওপর নাজিল করতাম, তাহলে তুমি দেখতে পেতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আমি মানুষের সামনে এসব উদাহরণ এজন্য পেশ করি, যাতে তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) ভেবে দেখে।'[১৪]

[১২] সূরা ওয়াকিয়াহ : ৭৯
[১৩] সূরা নাহল : ১০৭
[১৪] সূরা হাশর : ২১

কুরআন ও বিজ্ঞান

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—কেন বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোকে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করলেন।

কুরআন সম্পর্কে বিজ্ঞান

> 'কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা খুবই চমকপ্রদ। সব সময়ই এ দুটি ক্ষেত্রের মাঝে সমন্বয় দেখা যায়। বিতর্ক ও বিভাজন এখানে একেবারেই অনুপস্থিত।'[১৫]

কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো অধ্যয়ন করার পর ফরাসি এ বিজ্ঞানী উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। আল কুরআন এমনই একটি গ্রন্থ, যেখানে মানুষকে হিদায়াতের বাণী শোনানোর অংশ হিসেবে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলোকেও চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআন নিয়ে ইতঃপূর্বে হওয়া সকল গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে—এতে বর্ণিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তথ্য সঠিক ও যথার্থ।

কুরআনে ১৫শ বছর আগে যা বলা হয়েছে, আজকের সময়ে এসে তা-ই প্রমাণিত হচ্ছে। আমাদের কাছে কুরআনের তথ্যগুলো 'পরিচিত বা আগে থেকেই জানা' বলে মনে হচ্ছে, তা-ই হয়তো আমরা এ মহাগ্রন্থের বিশেষত্ব পুরোপুরি বুঝতে পারছি না।

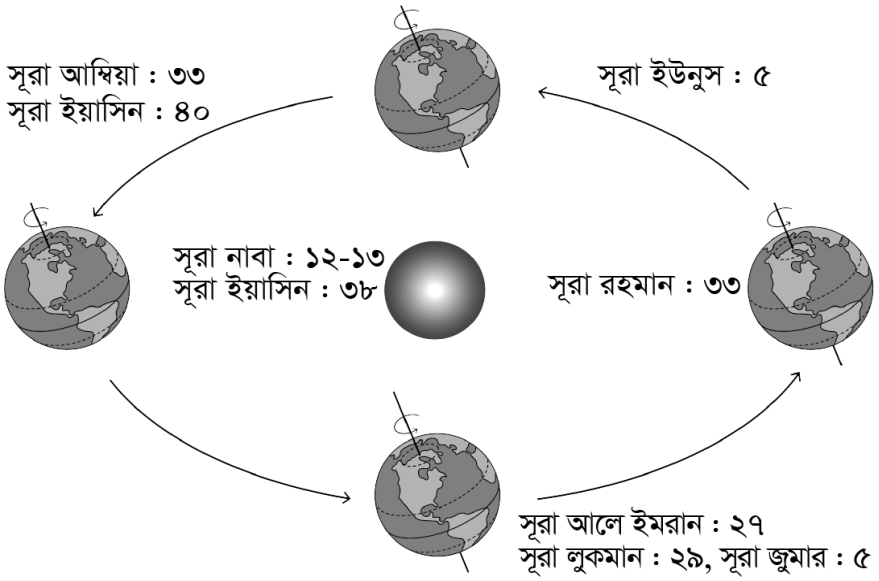

[১৫] *দ্যা বাইবেল, দ্যা কুরআন অ্যাণ্ড সাইন্স;* ড. মরিস বুকাইলি : পৃ.-১০

কিন্তু আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি—১৫শ বছর আগে নবিজির কাছে এই তথ্যগুলো এসেছিল, যখন বিজ্ঞান তো দূরের কথা, কেউই এসব তথ্য কল্পনাও করতে পারেনি। তাহলে হয়তো কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলোর যথার্থতা আমাদের কাছে বিস্ময়কর বলেই মনে হবে।

কুরআনে গ্রহ, প্রাণিজগৎ, মাটি, মহাকাশ বা মানুষ নিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছে, এর কোনো কিছুই তৎকালীন সময়ের মানুষের জানা ছিল না। তাদের কাছে এসব তথ্য ছিল একেবারেই নতুন। আরেকটি অদ্ভুত বিষয় হলো—নবিজি তখন আরবের একটি অঞ্চলে বসবাস করতেন, যা ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে অনগ্রসর এলাকা বলে বিবেচিত। তখন অবধি আরবে কোনো অধ্যয়ন কেন্দ্র, স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না।

আল্লাহ তায়ালা শুধু আমাদের মোহিত করার জন্যই কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো উল্লেখ করেননি; বরং এগুলো তিনি নিদর্শন ও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যেন আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনতে পারি এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনবিধান ইসলামকে অনুসরণে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারি।

তবে কুরআনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে জানার প্রচেষ্টায় যদি সঠিকভাবে কিছু বুঝতে না পারি, তাহলে আমাদের উচিত ধৈর্য ধরা এবং সাহায্য কামনা করা আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘তিনিই তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছেন। এ কিতাবে দুই ধরনের আয়াত আছে—এক হচ্ছে, মুহকামাত; যেগুলো কিতাবের আসল বুনিয়াদ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, মুতাশাবিহাত। যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময় মুতাশাবিহাতের পেছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার চেষ্টা করে থাকে; অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। বিপরীত পক্ষে পরিপক্ব জ্ঞানের অধিকারীরা বলে—“আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে।” আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই কোনো বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।’[১৬]

খ্রিষ্টানরা বহু বছর বিজ্ঞানচর্চাকে অপছন্দ করলেও মুসলিমরা কখনোই বিজ্ঞানের বিষয়ে অনাগ্রহী ছিল না। তাঁরা কখনো বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থানও নেয়নি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজে আমাদের বারবার প্রকৃতির দিকে তাকাতে বলেছেন, প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর নির্দশনগুলোকে মূল্যায়ন করতে বলেছেন। কেননা, এর মাধ্যমেই আমাদের ঈমান সুদৃঢ় হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘(এই সত্যটি চিহ্নিত করার জন্য যদি কোনো নিদর্শন বা আলামতের প্রয়োজন হয়, তাহলে) যারা বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে, তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর ঘটনাকৃতিতে, রাতদিনের অনবরত আবর্তনে, মানুষের প্রয়োজনীয় ও উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগর দরিয়ার চলমান জলযানসমূহে, বৃষ্টিধারার মধ্যে, যা আল্লাহ বর্ষণ করেন ওপর থেকে, তারপর তার

[১৬] সূরা আলে ইমরান : ৭

মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন দান করেন এবং নিজের এই ব্যবস্থাপনার বদৌলতে পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন, আর বায়ু প্রবাহে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।'[১৭]

আমাদের চারপাশের প্রকৃতির যত চমকপ্রদ বিষয় চোখে পড়ে, সবই রাব্বুল আলামিনের অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। এই দৃশ্যগুলো যেন আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়, আল্লাহর ইবাদত করার ব্যাপারে আমাদের মাঝে খুলুসিয়াত ও আন্তরিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ সবাইকে সাহায্য করুন। আমিন।

কুরআনের কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য

পিঁপড়া প্রসঙ্গে : পিঁপড়াদের অধিকাংশই স্ত্রীলিঙ্গের। পুরুষ পিঁপড়া অনেকদিন পরপর পাওয়া যায়। সংগমের পর পুরুষ পিঁপড়াগুলো বেশিদিন বাঁচে না। যে সকল পিঁপড়া সারাদিন কাজ করে বা ছোটাছুটি করে—সবগুলোই নারী প্রজাতির। পিঁপড়ারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে এবং যোগাযোগের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষাও আছে।

আরবিতে পিঁপড়াকে বলা হয়—'আন-নামল'। আল কুরআনে বর্ণিত আছে— নবি সোলায়মান (আ.) পিঁপড়ার ভাষা শুনতে পেয়েছিলেন। একটি পিঁপড়া তার অন্যান্য সহচর পিঁপড়াদের দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছিল। তা না হলে সকলেই পিষ্ট হয়ে যাবে। কুরআন সেই আয়াতে পিঁপড়াকে আরবি 'কালাত' শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। এই শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের। অর্থাৎ যে পিঁপড়াটি অন্য পিঁপড়াদের সতর্ক করছিল, তা নারী প্রজাতির।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—যে যুগে কুরআনের এই সূরাটি নাজিল হয়েছে, সে যুগের মানুষ জানতই না, পিঁপড়াদের মধ্যেও লিঙ্গভেদ আছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'(একবার সে তাদের সাথে চলছিল) এমনকি যখন তাঁরা সবাই পিঁপড়ার উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন একটি পিঁপড়া বলল—"হে পিঁপড়ারা! তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো। যেন এমন না হয় যে, "সোলায়মান ও তাঁর সৈন্যরা তোমাদের পিশে ফেলবে এবং তাঁরা টেরও পাবে না।" সোলায়মান তার কথায় মৃদু হাসল এবং বলল— "হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি, যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি করেছ এবং এমন সৎকাজ করি, যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো।"'[১৮]

---

[১৭] সূরা বাকারা : ১৬৪

[১৮] সূরা আন-নামল : ১৮-১৯

আমরা কেন এখানে

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনের তাৎপর্য কী।

আমাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য কী

'জিন ও মানুষকে আমি শুধু এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার দাসত্ব করবে।'[১৯]

আমরা এরই মধ্যে জেনেছি—মানুষকে বিশেষ কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো আত্মসচেতনতা, বুদ্ধিমত্তা, দর্শন ক্ষমতা, অনুভূতি প্রভৃতি। এগুলোই আমাদের শক্তি। আবার মানুষের ভেতর কিছু প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনাও রয়েছে। মানুষ অনেক সময় অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েও এসব প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'আসলে পৃথিবীতে যা কিছু সাজসরঞ্জামই আছে, এগুলো দিয়ে আমি পৃথিবীর সৌন্দর্য বিধান করেছি তাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্য থেকে কে ভালো কাজ করে।'[২০]

প্রবৃত্তির দাসত্বই হলো আমাদের দুর্বলতা। আল্লাহও এটা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন—

'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[২১]

এ দুটি বিপরীতধর্মী শক্তি বা বৈশিষ্ট্য আমাদের সবার ভেতরেই কাজ করে। যখন আমরা বিপরীতধর্মী দুটি বিষয়কে একসাথে সার্থকভাবে মেলাতে পারি, যথাযথ ভারসাম্য করতে পারি, তখনই একটি আদর্শ মানবিক চেতনার উত্থান হয়।

মানুষের সহজাত ফিতরাত ইতিবাচক। আমাদের মন বরাবরই নিজেদের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে প্রকৃত ক্ষমতাবান সত্তাকে অনুসন্ধান করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। কিন্তু শয়তান তাতে বাঁধ সাধে, প্ররোচিত করতে চেষ্টা করে, ভেতরের বর্বরতা ও পশুবৃত্তিকে সামনে নিয়ে আসতে চায়। সে আমাদের আবেগকে প্রভাবিত করে পাশবিক প্রবৃত্তির ফাঁদে আটকে ফেলার আয়োজন করে।

কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শয়তানকে কেন আমাদের প্ররোচিত করার সুযোগ দেওয়া হলো? এর উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ মানুষ ও জিনকে কেবল তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

---

[১৯] সূরা জারিয়াত : ৫৬
[২০] সূরা কাহাফ : ৭
[২১] সূরা নিসা : ২৮

এই গোটা বিশ্বজগতের সবকিছুর জন্যই আল্লাহর বিধান রয়েছে এবং তারা তা মেনে চলে। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু মানুষ। তাদের আল্লাহ সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়েছেন।

মানুষ ইচ্ছে করলে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। আবার পারে অবজ্ঞাও করতে। জিনকে মানুষের মতো এতটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। তাই জিন ততটা ঔদ্ধত্য দেখানোরও অবকাশ পায় না। এক মুহূর্তের জন্য আমরা যদি থেমে একটু চিন্তা করি—আল্লাহ আমাদের কতটা স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাহলে রীতিমতো বিস্মিত হতে বাধ্য হব।

আল্লাহ আমাদের সর্বোচ্চ মুনাফা দিয়ে সম্মত করার চেষ্টা করেছেন; অথচ তিনি চাইলে মানুষকে অনেক সহজেই বাধ্য সেবকে পরিণত করতে পারতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘হে ঈমান আনয়নকারীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো, এটাই তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর যদি তোমরা তা জানো। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদের এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদের সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড়ো সফলতা।’[২২]

> ‘তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার, আবার বদলা নেওয়ার জন্য পুনর্বার তৈরি করবেন। যারা ঈমান এনেছে এবং ইনসাফের সাথে নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। আর যারা কাফির হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। কারণ, তারা কুফরি করছিল।’[২৩]

জীবন হলো একটি পরীক্ষা

আল্লাহ স্পষ্টভাবেই আমাদের বার্তা দিয়েছেন—আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। তাঁর জন্য কাজ করতে হবে। যারা এখনও সত্যকে চিনতে পারেনি, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তাদের মাঝে দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলেই আমাদের পরকালীন স্থায়ী জীবনে পুরস্কৃত করা হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

> ‘আল্লাহ ন্যায়নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়স্বজনদের দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীল-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো

[২২] সূরা সফ : ১০-১২
[২৩] সূরা ইউনুস : ১০

> যখনই তোমরা তাঁর সাথে কোনো অঙ্গীকার করো এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর আবার তা ভেঙে ফেলো না, যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের ওপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত। তোমাদের অবস্থা যেন সেই মহিলাটির মতো না হয়ে যায়, যে নিজ পরিশ্রমে সুতা কাটে এবং তারপর নিজেই তা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে। তোমরা নিজেদের কসমকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোঁকা ও প্রতারণার হাতিয়ারে পরিণত করে থাকো, যাতে একদল অন্য দলের তুলনায় বেশি ফায়দা হাসিল করতে পারো। অথচ আল্লাহ এ অঙ্গীকারের মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষার মুখোমুখি করেন। আর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদের সমস্ত মতবিরোধের রহস্য উন্মোচিত করে দেবেন।'[২৪]

কিন্তু যেসকল ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া বিধানকে অস্বীকার করে নিজেদের খেয়াল খুশিমতো প্রবৃত্তির দাসত্ব করে যায়, তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। যদিও তারা এমনভাবে জীবনযাপন করে, যেন মৃত্যু কখনোই তাদের স্পর্শ করবে না। তারা অভাবীদের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়; অথচ কোনো পাত্তা দেয় না।

তারা মাদক, মদ আর ধূমপান করে নিজেদের শরীরকে ধ্বংস করে দেয়। তারা নিজেদের অর্থকে যাচ্ছেতাইভাবে ব্যয় করে। অন্যান্য মানুষকেও অবহেলা ও অবজ্ঞা করে। তাহলে তারাও কি নেককারদের মতোই মূল্যায়ন পাবে? কখনোই নয়। তেমনটা হলে কখনোই ইনসাফ হতো না। আল্লাহ কুরআন মাজিদেও বারবার বলেছেন—

> 'যারা ভালো কাজ করে আর যারা মন্দ কাজ করে, তারা কখনোই সমান হতে পারে না।'[২৫]

[২৪] সূরা নাহল : ৯০-৯২

[২৫] সূরা সিজদাহ : ১৮, সূরা মুমিন : ৫৮ এবং সূরা হা-মিম সাজদাহ : ৩৪